***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***UGC Enlisted Serial No. 48666***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 98-105*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# সীমাবদ্ধতার উত্তরণে লেখকমন : হরিশংকর জলদাস

**দেবজ্যোতি মণ্ডল**
*গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়*

***Abstract***

*During the period of post-independence a sudden revival broke in the Bengali literature as well as Bangladesh literature. The context of fictions or short stories of that period was greatly altered. The gaudiness and the ambitious city life were now removed from the perspectives of the authors of that time. Rather they begin to produce a new genre in literature concenning life and everyday struggles of so called forbidden class. Their pleasures, pains, struggles everything becomes the subject of author's pen. This genre was again recreated in the writings of Dr. Harishankar Jaladas, whobelongs to a fisherman family. Harishankar's pen sketch the life of downtrodden, some of whom are from among fisherfolks, some from among prostitutes and some others are the 'harijon' or 'methors'. His writings become alive through the use of his local dialect that defines the character as living being. We will analysis the 'Jaladashir Golpo' in this essay.*

*Harishankar often takes his plots of the stories to the fisherfolks of Patenga village. He has presented his eye-witnessed experience through these stories.*

*Throughout these stories a picture of unhappy married life and as its inevitable consequence extramarital affairs often take place. Even on the other hand we see the strong attachment of husband & wife. Also we witness a inter-caste relationship between a fastidious Brahmin and untouchable women from subaltern community. The same kind of plot construction can be seen in others story, where relationship grow between fisherwomen and high class hindus. A part from some of the stories are taken from the perspective of the 'war of liberty' of 1971. It is true that, the stories of Dr. Jaladas have no extension, rather they are bound with limitations. But even within limitations he teacher the reader as to dream the dream of revival.*

***Key words: Regionalism, Religiosity, Insecurity between relationships, Versatility of women characters, Limitations, Revival.***

**মূল প্রবন্ধ:** ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তরকালের বাংলা কথাসাহিত্যে তথা, ছোটগল্পের জগতে যে বিবর্তন ঘটেছিল, তার ছাপ পড়েছিল ওপার বাংলার সাহিত্যেও। এইসময়ের সাহিত্যে নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিকতার বদলে

প্রান্তিকজীবন তথা, নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের ছবি বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, কল্লোলের কাল থেকেই ডোম, হাড়ি, নিষাদ, বাগদি, কৈবর্ত প্রভৃতি ব্রাত্য পেশার মানুষের যাপনকথা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছিল। দেশভাগ, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরেও তথাকথিত প্রান্তিক মানুষদের অবস্থান যে আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল, এমনটা নয়। নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা সর্বোপরি জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার ধারা ছিল অব্যাহত। নিম্নবর্গের সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসও তাঁর দীর্ঘজীবনে নানা বঞ্চনা, অবহেলার শিকার হয়েছেন। তাই অস্পৃশ্যতার বেড়াজালে আটকে থাকা দলিত, তথা ব্রাত্য মানুষদের দীর্ঘদিনের দীর্ঘশ্বাসের পরিশিলিত রূপদান করেছেন তাঁর সাহিত্য।

উত্তর আধুনিকতার বাংলা সাহিত্যের অনন্য রূপকার সাহিত্যিক ড. হরিশংকর জলদাস। ওপার বাংলার এই সাহিত্যিক ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের শৈশব ও কৈশোরের অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় বা কৈবর্ত পাড়াতে। দুই মাইল দূরের এক পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাবা যুধিষ্ঠির জলদাসের স্বপ্নকে সার্থক করে তিনি স্কুলজীবনের গণ্ডি পাড় করেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। বর্তমানে তিনি অধ্যাপনা কর্মের সঙ্গে যুক্ত। নদীকেন্দ্রিক জেলে জীবনের উপর একাধিক গবেষণা করেছেন, লিখেছেন একাধিক উপন্যাস ও ছোটোগল্প। তিনি শুধু কাহিনি লেখেন নি, খুব কাছ থেকে সমাজকে দেখেছেন। তাই তাঁর রচনাতে জীবনবাস্তবতা অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের নিম্নবর্ণের কৈবর্ত সমাজের চিরচেনা ছবিকে তুলে ধরেছেন 'জলপুত্র', 'মোহনা', 'কমবি', 'একলব্য' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে।

অন্য এক সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নামে' পাঠক যে জলজীবী সমাজের ছবি দেখেছেন, সেই জলজীবনের যাপনচিত্রকে একুশ শতকের নবাগত সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস তাঁর 'জলদাসীর গল্পে' তুলে ধরেছেন। যদিও 'তিতাস একটি নদীর নাম' এ মালোদের জীবন ছিল নদীকেন্দ্রিক। কিন্তু নদীকেন্দ্রিক জেলেজীবনের বাইরে বেরিয়ে হরিশংকর জলদাস বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী জেলেসমাজের কথাকে শিক্ষিতজনের ড্রইংরুমে স্থান করে দিয়েছেন। প্রান্তীয় জেলেসমাজের নারীদের ছবি ধরা পড়েছে 'জলদাসীর গল্প' সংকলনের দশটি গল্পে। একদিকে আঞ্চলিকতা, অন্যদিকে জীবন বাস্তবতা সমন্বয়ে এই গল্পগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থপ্রকাশের সম্পাদক লিখেছেন-- "জেলে দাম্পত্যজীবন সমবায়ী। এ জীবনে নারী পুরুষের সমান অবদান। কিন্তু অন্যান্য সমাজের মতো জেলে নারীও বঞ্চিত-অবহেলিত। তাদের মর্মন্তুদ হাহাকার, বিপর্যয়-বিপন্নতার বেদনাজীর্ণ গৃহকোণে গুমরে মরে। হরিশংকর গ্রন্থস্থ দশটি গল্পে এই জেলেনিদের জীবনকথা শুনিয়েছেন।"[১]

প্রথম গল্পের নাম 'কোটনা, যার আক্ষরিক অর্থ হল যে পুরুষ গুপ্তপ্রণয়ে নারী-পুরুষের মিলনে সহায়তা করে। গল্পের নামকরণের মধ্যদিয়ে কোটনাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, মুচির ছেলে অশোকের বন্ধু হয়েছে 'জেলে পউলা' ক্ষীরমোহন জলদাস। তারা দুজনে একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। সমাজের জাতিভেদ প্রথার ভয়াবহতা স্কুলেও অব্যাহত ছিল। তাই জেলে বা মুচির ছেলে বলে প্রধান শিক্ষক চক্রবর্তী মশাই বলে দেন— "ক্লাসের একবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই, খবরদার সামনে বসার চেষ্টা করবী না কখনো।"[২] এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে জাতিভেদ প্রথার ভয়ঙ্করতার ছবি এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছে স্কুলে অনেক অবিচার ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এই বর্ণবৈষম্যের শিকার দুই ব্রাত্যকিশোর অশোক ও ক্ষীরমোহনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে দেখা যায় যে, পড়াশোনায় ভালো হওয়া সত্ত্বেও একদিন ক্ষীরমোহন কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

অন্যদিকে নিজের মুচিসত্ত্বাকে অগ্রাহ্য করে সে অশোক 'দাস' থেকে অশোক 'চৌধুরী'তে পরিবর্তিত হয়েছে, পেয়েছে স্কুলের শিক্ষকতাও। কায়স্থ বংশের মেয়ে কুসুমকে বিয়ে করে সে সমাজেসম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছে।

আসলে অশোক সমাজের নিম্নবর্গের ছেলে বলে হীনমন্যতার শিকার হয়ে নিজের শিকড়ের টানকে উপেক্ষা করেছিল। যদিও জলদাস সম্প্রদায়ের ছেলে ক্ষীরমোহন নিজের অস্তিত্বের বিষয়ে ছিল সদাসচেতন। তাই অশোকের পদবি পরিবর্তনকে সে মেনে নিতে পারে নি। পরিণতি অংশে দেখা যায়, পুরনো বন্ধু ক্ষীরমোহনের সঙ্গে অশোকের দেখা হলে অশোক ছেলেবেলার কথা তোলে, আর জানতে চায় তার বাড়ি ছাড়ার কারণ। ক্ষীরমোহন স্মৃতিচারণে ফিরে যায় সেই অভিশপ্ত দিনে-- "তোমার মনে আছে কিনা জানি না। যেদিন হেডস্যার তোমার পদবী নিয়ে রঙ্গ তামাসা করলেন, সেদিন একটু আগেভাগেই স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে তুমি চলে গেলে তোমার বাড়ির দিকে। আমি পা বাড়ালাম আমার ঘরের দিকে। মা তো ঘরে আছে। এদিক ওদিক তাকালাম। মাকে দেখলাম না। ঘরে বাঁশের দরজা আধো খোলা। আমি আনমনে ঘরে ঢুকে গেলাম। ...তাকিয়ে দেখলাম- ঘরের ভেতর মা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাকা তার বুকের উপর।"[৩] বিবাহে অনিচ্ছুক কাকা গৌরচাঁদ যে, ক্ষীরমোহনের বাবা শ্যামচাঁদকে কোনো কাজে সাহায্য পর্যন্ত করে না। তাই কঠিন পরিশ্রমে আর সাংসারিক চাপে শ্যামচাঁদ অকালেই হারিয়ে ফেলেছে তার যৌবনকে। তার ফলস্বরূপ ক্ষীরমোহনের মা নিজের অবদমিত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে দেওর গৌরচাঁদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। জেলে সম্প্রদায়ে ঘটে চলা এই স্বাভাবিকতাকে মেনে নিতে পারে নি স্কুলের এই মেধাবি ছাত্র ক্ষীরমোহন। তাই কাকার প্রতি তার রাগ, ঘৃণা যত না তার থেকেও অনেক বেশি ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছে মায়ের এই আচরণকে। সে নিজেও মনে করে "বেশ্যার পোলার কোটনা হওয়াই তো স্বাভাবিক এই ধারণায় সে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে।"[৪] একদিকে এই অবৈধ মিলনের ছবি, অন্যদিকে নিজের আত্মসম্মানের গ্লানি ক্ষীরমোহনকে এই কোটনাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

এইভাবে হরিশংকর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জেলেসমাজের অন্দরমহলের পরকীয়া মিলনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও গল্পের গঠনগত দিকে সফল হতে পারেন নি। তবুও একজন জেলেপাড়ার সদস্য হিসাবে নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতায় চিরচেনা পরিচিত জলদাসীদের যৌন যাপনচিত্রকে এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী গল্পের নাম 'দইজ্যা বুইজ্যা'। চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ হলেও ভিন্ন স্বাদের এই গল্পে লেখক স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল। পাকিস্থানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচারে বঙ্গোপসাগরের পতেঙ্গাবাসী জেলেপাড়ার করুণ কাহিনি এই গল্পের বিষয়। পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাপ্টেন মোর্শেদ ও স্থানীয় মোসাহেব রাজাকার বাহিনীর সৈন্যদের হাতে ধর্ষিত হয় জেলেপাড়ার জগমোহন জলদাসের মেয়ে পারুলবালা। পারুলের মা তোতারাণীকে নিশ্চুপ জেলেপাড়ার মেয়ে বউরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—"চুপ গর, অ বদ্দি চুপ গর। কলঙ্কের কথা বিলাপ গরি আর নো ফুনাইও। হিন্দু-মুসলমানে জাইনল্যে কলঙ্ক আরো বাড়িবো।"[৫] এর থেকে স্পষ্ট হয় জেলে সম্প্রদায়ের অবস্থান, তাদের সঙ্গে যেমন হিন্দুদের সম্পর্ক নেই, তেমনি মুসলমান সমাজেও তার ব্রাত্য। তাই মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল দিনেও হিন্দু-মুসলমানদের মতো তারা উপকূল ছেড়ে যেতে পারেনা। কামের তাড়নায় মোর্শেদ ও রাজাকার বাহিনী পুনরায় পারুলকে গণধর্ষণ করতে গেলে প্রতিবাদী চরিত্র দইজ্যা বুইজ্যার হাতে তার প্রাণ যায়।

এইভাবে আদতে পাগল বলে পরিচিত এক বৃদ্ধ জলদাসের প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ ঘটেছে, একসময় সমুদ্রের খড়ো বাতাস যার সুখের সংসারকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সংসারহারা এই মানুষটি পারুলের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারকে জেলেপাড়ার অন্যদের মতো মুখ বুজে মেনে নেয়নি, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। আর যখন নিজেদের অবস্থান বিষয়ে সচেতন হয়ে রাজাকারদের বলেছে—"...হামরা লোক হিন্দু না। জাইল্যাছার, জাইল্যা আমোরা।"[৬] এই উক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজের কাছ থেকে পাওয়া দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। তাই কেবল পারুলবালার ধর্ষকদের বিরুদ্ধে নয়, জলদাসদের বিপর্যয়ের মাঝে দাঁড়িয়েও আসলে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

অধ্যাপক সুবিমল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো জাত্যাভিমান উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের জৈবিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে 'সুবিমলবাবু' গল্পটি। অবিবাহিত এই অধ্যাপক সমাজের চোখে উচ্চশিক্ষিত হলেও কৌলীন্যভাবনায় সে তাঁর বাবা হরিচরণকেও ছাপিয়ে যায়। ছকে বাঁধা জীবন আর, উচ্চবর্ণের সংস্কার-কুসংস্কারের জালে সে নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখে। নিজের মন, প্রাণ, শরীরকে উপেক্ষা করে যৌবনের প্রান্তলগ্নে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দেয়। আর তাই নিজের যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্য পরিচারিকা, তথা জেলেসমাজের মেয়ে মালতির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। যে সুবিমলের মনে ধর্ম ও বর্ণভেদ ছিল প্রবল, সেই সুবিমল জলদাসী মালতীর কামনার দাস হয়ে উঠেছে। গল্পকারের ভাষায়— "সকালে বাজারে গিয়ে সুবিমলবাবু কৈ মাছ কিনে এনেছেন। হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় যোগাসনে বসে আছেন তিনি। দরজার পাশে বারান্দায় মাছ কুটছে মালতি। বিছানা থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। মাছ কুটতে কুটতে বুকের আঁচল সরে গেছে মালতির। টুটফাটা ব্লাউজ ভেদ করে ডান পাশের পুষ্ট স্তনটি বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। বাম পাশের স্তনটি মালতির বাঁ হাঁটুতে চাপা পড়ে আছে। সুবিমল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।"[৭] শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মালতি বলেছে—"করেন কি, করেন কি ছার? ...আপনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছার, আমি সামান্য জলদাসী।"[৮]

'সুবিমলবাবু' গল্প পাঠ করতে গিয়ে চর্যাপদ কাহ্নুপাদের এই চরণটি স্মরণে আসে-- "নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। / ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িয়া।।"[৯] এই গল্পের মধ্যদিয়ে হরিশংকর জাতের ধ্বজাধারী উচ্চশ্রেণির মানুষ যারা, জাতের অভিমানের নিম্নবর্গের মানুষদের অবহেলা করে, তাদের মুখশ খুলে দিয়েছেন। একই সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে জৈবিক প্রবৃত্তির জয়গান গেয়েছেন। নারী ও পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাই সাহিত্যিক হরিশংকর সুবিমলের চরিত্রের অন্দরে ডুব দিয়ে তার মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অবদমিত কামনা, বাসনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। যার ফলে সুবিমল চরিত্রটি বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার জলদাসীদের করুণ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে 'দুখিনী' গল্পটিতে। এখানে 'দুখিনী' শব্দটি দ্যোতক অর্থ লাভ করেছে। একদিকে স্ত্রী অনন্তবালা, অন্যদিকে মা অনন্তবালার দুঃখ যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি মনমোহনের স্ত্রী রোহিনী জলদাসের করুণ পরিণতি গল্পটিকে ত্বরান্বিত করেছে। গল্পে দেখা যায় যে, মনমোহনের বাবা কেষ্টপদ আর পাঁচজন জলদাসের মতো আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অন্যত্র কাজ করতে যায়। এখানে জলদাসদের পুরনো জীবিকাতে বদলের ছবি লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাচক্রে স্ত্রী অনন্তবালাকে পরিত্যাগ করে সে বিধবা কেতকিবালার সঙ্গে সংসার বাঁধতে চেয়ে বলে-- "বউত জ্বালাইঅস চোদানির ঝি। এখন যা, তোর লাং অল লই দিন কাডা গই।"[১০] স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র সংসার পাতার ঘটনা উচ্চবিত্ত সমাজে অপরাধ হলেও নিম্নবর্গের জলদাসের কাছে এই জাতীয় ঘটনা কোন নতুন নয়।

অন্যদিকে কেষ্টপদ জলদাস হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আর্থিক উন্নতি হয়েছে। "এখন সে বহদ্দার। একটি নৌকা ও চার-পাঁচটি বিহিন্দিজালের মালিক। কুমিরার সমুদ্রে কিষ্টপদর তিন-চারটি বিহিন্দিজাল হরদম পাতানো থাকে। কিষ্টপদর ঘরে তিনতিনটি যোয়ান ছেলে। তাদের সাহায্যে সে ঘরদোর-সংসার সবই নতুন করে সাজিয়েছে।"[১১] এইভাবে কেষ্টপদর মতো অনেক জলদাসই দীর্ঘদিনের দারিদ্রতা কাটিয়ে স্বচ্ছল জীবন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে, সেই ছবিও ধরা পড়েছে। আবার বাস্তবে সমুদ্র উপকূলে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেকেই প্রাণ হারায়। ঠিক তেমনি কালাবাঁশির সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায় মনোমোহনও।

এই গল্পের বুনোট দুর্বোল হলেও স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে। এই গল্পে অনন্তবালার স্ত্রী ও মা সত্ত্বাএ তীব্র যন্ত্রণা পাশাপাশি পেয়ে হারানোর ব্যাকুলতা প্রবল হয়ে উঠেছে। যদিও সেইদিক থেকে গল্পকার মনোমোহনের স্ত্রীর হাহাকারকে তুলে ধরেন নি। এইভাবে গল্পটি অনন্তবালার মতো জলদাসী নারীর চিরকালীন দুঃখের কাহিনি হয়ে উঠেছে।

সমকালীন দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন ও বিবাহ বিহির্ভূত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'ঢেণ্ডেরি' গল্পটি। চট্টোগ্রামের এই আঞ্চলিক শব্দের অর্থ অসামাজিক কোনো কর্মের জন্য মাথা মুরিয়ে ঘোল ঢেলে জুতোর মালা পড়িয়ে গ্রাম পরিক্রমা করার মতো অপদস্ত করার এক রীতি। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে আজও কৈবর্ত সমাজে এই বিশেষ রীতির প্রচলন আছে। এই গল্পে দেখা যায় রাইগোপাল ও তার স্ত্রী লক্ষীবালা অসুখী দাম্পত্যজীবন। ঝগড়ার পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ দেবার রীতি জেলে সমাজের কাছে খুব সাধারণ ঘটনা। তাই লক্ষ্মীবালা সহজভাবেই স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছে— "আঁই খানকি নো, তোঁয়ার বউ। খানকি অইলে বেশ্যাপাড়াত্ থাইকত্তাম। বউত্ বেডা আঁর হঙ্গে ফুইত্তো। তুঁইও যাইতা মাঝে মইধ্যে।"[১২] এইভাবে পরকীয়া সম্পর্ককে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়ে থাকে। 'ভাউস্যা কেঁএড়া' এই রাইগোপালও এই জেলেপাড়ার অস্থায়ী বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে বহদ্দার হিসাবে বেশ অর্থ রোজগার করেছে, কিন্তু জেলেসমাজে সর্দারের মতো সম্মান লাভ করতে পারে নি। আর তাই উপার্জিত অর্থ সংসারে না দিয়ে রসবালার দারিদ্র ও যৌবনমধু লাভের জন্য বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। গভীর রাতে লক্ষ্মীবালা গ্রামের গোবিন্দ সর্দারের সহায়তায় হাতে নাতে ধরে রাইগপাল ও রসবালাকে। সকলের সামনে স্বামীর মুখোশ খুলে দেবার মধ্যদিয়ে লক্ষ্মীবালার প্রতিশোধস্পৃহার নিবৃত্তি ঘটে, এটা ঠিক। একইসঙ্গে স্ত্রী হিসাবে স্বামীর অপমানের আগুনে জ্বলতে থাকে তার লক্ষ্মীবালার নারীমন।

এই গল্পে দিনমজুর থেকে বহদ্দার হয়ে ওঠা রাইগোপাল, যে একসময় সমাজ থেকে সম্মান আশা করেছিল। ঘটনাচক্রে সেই রাইগোপাল নিজের কর্মদোষে সমাজের কাছে চরম অসম্মান লাভ করেছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কিভাবে দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসের সেতুকে ভেঙে দিতে পারে তার ছবি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি স্বামীর ঢেন্ডেরিপ্রথাকে চোখের সামনে দেখার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য সে দরজায় খিল দিয়ে কেঁদেছে। তাই সেবাপরায়ণ, পবিত্রতা লক্ষ্মীবালার দাম্পত্যজীবনের অসহায়, বিধ্বস্ত করুণ পরিণতি গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের পঠভূমিতে লেখা নাম শীর্ষক গল্প হল 'একজন জলদাসীর গল্প'টি। এই গল্পে দেখা যায়, দেশপ্রেমে জাগ্রত জগৎহরি জলদাস গভীর রাতে কর্ণফুলী নদী পেরিয়ে দেশের কাজে যাত্রা করে। ঘটনাচক্রে খানসেনাদের হাতে তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে তার স্ত্রী সরলাবালা স্বামীর আশায় দিন গুনতে থাকে। চৌত্রিশ বছর ধরে স্বামীর সুখস্মৃতিকে সঙ্গী করে আজ সেই সুন্দরী সরলাবালা পাগল হয়ে গেছে। সে কেবলই বলতে থাকে— "তাইলে আঁর সোয়ামি মরে নাই। গুলি লাগার পর আন্নে যদি বাঁচি থাইকত্তে পারেন, তাইলে আঁর সোয়ামিও বাঁচি আছে। তাইনে বাঁচি আছে। পোলার বাপ বাঁচি আছে।"[১৩] অভাগী জলদাসী সরলাবালা কৈবর্তসম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি মেনে 'সাঙ্গা' করতে পারতো, কিন্তু তা করে নি। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর প্রবল বিশ্বাসের উপর ভ্র করে সে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। গল্পের শেষে স্বামীর আগমণের আশায় থেকে থেকে সরলবালার পিচুটি ঢাকা চোখ চিরতরে বুজে যায়। করুণরসের এই গল্পে প্রান্তবর্গীয় সমাজে কেবল বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কই নয়, দৃঢ় প্রেমের সম্পর্কের ছবিও প্রকাশ পায়। সেরদিক থেকে হরিশংকরের এই গল্পটি কৈবর্তসমাজের দুখিনী এক নারীর চিরকালীন প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে।

সম্পূর্ণ নাটকীয় ও ভিন্ন স্বাদের গল্প 'চরণদাসী'। এই গল্পে কৈবর্ত নারী চরণদাসীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও স্বামীভক্তির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক অন্ধকারময় অতীতের কথা বলা হয়েছে। স্বামী হারাধন জলদাস ও সুখমোহনকে নিয়ে তার সুখের সংসার। যৌবনকালে হারাধনের সঙ্গে প্রেমের পূর্বে সাধন বহদ্দারের শালা আজলার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্কে চরণ গর্ভবতী হয়ে পড়ে। একদিকে আজলার কামুক চোখ, অন্যদিকে হারাধনের গান চরণের মনের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তোলে। ঘটনাচক্রে হারাধনের সঙ্গে বিয়ে হয় চরণদাসীর।

দীর্ঘদিন পর সন্তান লাভের বাসনা জাগে হারাধন ও চরণের মনে। চরণ জানায়— "আঁইতো কোনো টেবলেট মায়াবাড়ি নো খাই। অইলে এতদিনে নো অইতো না?"[১৪] গর্ভনিরোধক ওষুধের ব্যবহার জেলেপাড়ার অশিক্ষিত এই নারীর কাছে পরিচিত ঘটনা। ওঝার তাবিজ, মাদুলির সংস্কারকে উপেক্ষা করে আধুনিকমনস্ক এই নারী তার স্বামীর ডাক্তারি পরীক্ষা করে জানতে পারে, স্বামী হারাধন জন্ম থেকেই পিতা হতে অক্ষম। এই কঠিন সত্য জানার পরে হারাধন কি সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই কথা ভেবে চিন্তান্বিত চরণদাসী। নারীর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের পাশাপাশি কৈবর্তসমাজে আপাত সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের পিছনের ইতিহাস যে কি হতে পারে তারও একটা আভাস দিলেন গল্পকার হরিশংকর জলদাস।

অন্য আর একটি সামাজিক গল্প হল 'প্রতিশোধ'। নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী হলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেখা এই গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পরিবারে নারীর করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র মাধুরী। প্রচলিত কৈবর্তসমাজের বাইরে বেরিয়ে মাধুরীর বাবা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের নামকরণ ব্যবহার করেছে আবার 'জলদাস' হয়েও তারা বাবা সুইপারের কাজ করে। সামাজিক ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে মাধুরী হয়ে ওঠে আধুনিক মনস্ক ও শিক্ষিত। ঘটনাচক্রে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পাকসেনাদের অত্যাচারের হাত থেকে মাধুরীকে উদ্ধার করতে বিবাহ দেওয়া হয় চাকুরিজীবী পাত্রের সঙ্গে। গল্পের পরিণতি অংশে দেখা যায়, লম্পট-মাতাল স্বামী আর অত্যাচারী শাশুড়ির করাল গ্রাসে প্রাণ হারায় মাধুরী।

এই গল্পে দেখা যায়, জলদাসরা দীর্ঘদিনের প্রচলিত সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছে। অন্যদিকে মাধুরীর স্বামী বিচিত্রবীর্যের মতো চাকুরিজীবী জলদাসদের উৎশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ছবিও ধরা পড়েছে। তবে সব ছাপিয়ে গেছে মৃত মেয়ের কাছে তার বাবার স্বীকারক্তি— "আমাকে মাফ করে দেরে মা আমারে ক্ষমা করে দে।"[১৫] তাই এটি সামাজিক বেড়াজাল ছিন্ন করেও জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়া এক বাবার গল্প হয়ে উঠেছে।

আবার 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে কৈবর্তসম্প্রদায়ের মেয়ে দুলারি, যে জেলেপাড়ার বাইরে এসে নিজের মতো করে জীবন কাটাতে চেয়েছিল, তার করুণ পরিণতি এই গল্পের বিষয়। মহেশখালি সংলগ্ন গ্রামের মেয়ে গারমেন্টস্ কোম্পানিতে চাকরি করতে গিয়ে কায়স্থ বংশীয় শ্যাম দত্তের সঙ্গে প্রলোভনের শিকার হয়। অন্তঃসত্ত্বা দুলারি শ্যাম দত্তের দ্বারা প্রতারিত হয়ে পাগল হয়ে যায়। পরে শহুরে পুরুষের দ্বারা একাধিকবার ধর্ষণের শিকার হয়। পাগলি দুলারি নিজে বেশ্যাবৃত্তির মধ্যদিয়ে নিজের সন্তানকে বড়ো করতে চায়। এখানে তাঁর মাতৃত্বের গভীর আকুতি লক্ষনীয়। ঘটনাচক্রে এক অধ্যাপক এই নির্মমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে তাঁকেও এলাকা ছাড়তে হয়।

এই গল্পের প্লট জেলেপাড়া থেকে পরিবর্তিত হয়ে শহরের ফ্ল্যাটে এসেছে। একজন কৈবর্ত নারী শহুরে সমাজে বর্ণবৈষম্যের শিকার যেমন হয়েছে তেমনি, নানান বঞ্চনা, প্রতারণা, লালসার শিকার হয়ে দুলারির মতো বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দুলারির মধ্য দিয়ে আধুনিক কৈবর্তনারীদের ক্রুণ পরিণতির ছবিকে গল্পকার অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে লেখা গল্প 'মোহনা' গল্পটির বিষয় কৈবর্তরাজা ভীমসেনের সঙ্গে পাল রাজাদের যুদ্ধ এবং এই গল্পের পরিণতিতে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি চন্ডকের মস্তক ছেদনের কথা বলা হয়েছে। ভীম পালের সহযোদ্ধা চন্ডক পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে পাল রাজাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ক্ষমতা লাভের আশায় বরেন্দ্রভূমির সূর্য ভীমকে সবংশে নিধন করে পাল রাজার সেনাপতি হয়ে ওঠেন। ঘটনাচক্রে বারাঙ্গনা পল্লীতে মোহনার হাতে চন্ডকের মৃত্যু হয়।

কৈবর্তসমাজ জীবন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হরিশঙ্কর অনেক অতীত কথা শুনেছেন, আর তাই সেই অতীত কথাকে আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে নির্মাণ করেছেন এই গল্পটি। এখানে বারাঙ্গনাদের আচার-আচরণের টুকরো

ছবি পাওয়া যায়। নিজের শরীরের উপর চন্ডকের অত্যাচারকে সহ্য করতে পারলেও তার বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নিতে পারে নি। হত্যার পূর্বে মোহনা তাই বলেছে— "তোর আসল পুরস্কারটা নিয়া যারে চন্ডক। তোরে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি পালিয়ে যায় নাই। অধীর আগ্রহ নিয়া তোর জন্য অপেক্ষা করছি।"[১৬] সেইদিক থেকে মোহনার কণ্ঠে দেশপ্রেমের যে জয়গান ধ্বনিত হয়েছে হয়েছে, তা বলা যেতে পারে।

'জেলের পউলা' বলে পরিচিত হরিশংকরের এই গল্পগুলিত তীক্ষ্ণ জীবনঅভিজ্ঞতার ফসল। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। গল্পে চরিত্রগুলো বাস্তব ও অবাস্তবের রসায়নে সৃষ্টি হয়েও হয়ে উঠেছে রক্তমাংসের চরিত্র। গল্পের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত যথেষ্ট আকর্ষণীয়। লেখকের রচনার বিশেশত্ব এই যে, রচনার শেষভাগে পাঠকের চেতনায় কুঠারঘাত করে চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ পরিণতি দিয়েছেন। নদী, সমুদ্র, ব্রাত্যজনের জীবন তাঁর খুব প্রিয় বিষয়। 'কৈবর্ত জীবনের রূপকার' এই সাহিত্যিক কেবল জলদাসদের জীবনকে তুলে ধরেননি, ইতিহাসের পথ বেয়ে তিনি জলদাসের অন্বেষণ করেছেন।

হরিশঙ্করের গল্পের প্রেক্ষাপট সাধারণত পতেঙ্গার জেলেপাড়া। দীর্ঘজীবনে চোখের সামনে দেখা নানান টুকরো ঘটনাকে আধুনিক ভাবনায় রূপায়িত করেছে। 'কোটনা', 'দুখিনী', 'ঢেন্ডেরি' বা 'চরণদাসী'র মতো গল্পের ভিত্তিভূমি জেলেপাড়া। এই গল্পগুলিতে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ছবি পাওয়া যায়। আবার পতিপ্রেমের চরম নিদর্শন পাওয়া যায় 'একজন জলদাসীর গল্পে'র সরলাবালা চরিত্রের মধ্যদিয়ে। যদিও 'সুবিমলবাবু' গল্পে ব্রাহ্মণ-জলদাসের অসমবর্ণের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। জেলেসমাজের মেয়েরা নিজের পরিবারের আন্তঃসম্পর্কের রীতিকে ভেঙে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই একই ছবি পাওয়া যায় 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে যেখানে জলদাসীর সঙ্গে কায়স্থের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যদিও তা পরিণতি পায় নি।

আবার 'দুইজ্যা বুইজ্যা' ও 'প্রতিশোধ' গল্পের প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই সমকালে সেনাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের ছবি এই গল্পগুলিতে পাওয়া যায়। অস্থির সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা 'প্রতিশোধ' গল্পে লেখক উত্তরণের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। যে জেলেসম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান সমাজের কাছে অবহেলিত ছিল তারাই একসময় হিন্দুয়ানাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। মাধুরীর নামকরণের মধ্যদিয়ে তার আভাস পাওয়া যায়। আবার সমুদ্রে মাছ ধরা এই জলদাসেরা জেলেপাড়ার বাইরে গিয়ে কর্ম করেছে, সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে বংশানুক্রমিক জীবিকার উত্তরণও যেমন ঘটেছে তেমনি, আর্থিক স্বচ্ছলতার ছবিও জেলেসমাজের লক্ষ্য করা যায়। এমনকি দুলারির মতো জেলেসমাজের মেয়েরা শহরের পথে পা বাড়িয়েছে অর্থ রোজগারের আশায়। এখানে কোথাও যে লিঙ্গ বা বর্ণবিভেদকে লেখকমন উপেক্ষা করেছেন।

এটা ঠিক যে, হরিশঙ্কর জলদাস তাঁর গল্প বা উপন্যাসে ব্যাপ্তি নেই। বরং সীমাবদ্ধতা অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। তাই কৈবর্ত সমাজবৃত্তের বাইরে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যেতে পারেন নি। সেক্ষেত্রে তাঁর রচনায় আঞ্চলিকতার ফল্গুধারা বহমান। জেলেপাড়া ও সেখানের অবহেলিত মানুষের জীবনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই বারেবারেই নিজের শিকড়ের টানকে অনুভব করেছেন। শুধু তাই নয়, কৈবর্তসম্প্রদায়ের অন্দরের কথা বলতে গিয়ে তাদের জীবনের অনিশ্চয়তা, সমস্যা, টানাপোড়েনের কথা হয়তো বেশি দেখিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৈবর্তসমাজের উত্তরণের প্রচেষ্টাকে পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। তাই লেখকমন সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও পাঠককে উত্তরণের স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

**তথ্যসূত্র :**

১। হরিশঙ্কর জলদাস, জলদাসীর গল্প, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ মলাট অংশ
২। তদেব, পৃঃ ১০
৩। তদেব, পৃঃ ২০
৪। তদেব, পৃঃ ২০
৫। তদেব, পৃঃ ২১
৬। তদেব, পৃঃ ২৫
৭। তদেব, পৃঃ ৩৫-৩৬
৮। তদেব, পৃঃ ৩৬
৯। ড. নির্মল দাশ (সম্পাদক), চরযাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ১ আগস্ট ২০১২, পৃঃ ১৩৭
১০। হরিশঙ্কর জলদাস, জলদাসীর গল্প, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ৪০
১১। তদেব, পৃঃ ৪২
১২।
১৩। তদেব, পৃঃ ৫৯
১৪। তদেব, পৃঃ ৭৫
১৫। তদেব, পৃঃ ৮৮
১৬। তদেব, পৃঃ ১১১